বেণী সংহার   পর্ব এক

বন্ধ কারখানার জমিতে কিছুতেই নাকি কারখানা করা যাবে না - আইনের বাধা আছে। তবে ঠিক যে কি আইনের বাধা আছে তা মন্ত্রী-সান্ত্রী-পাত্র-মিত্র সভাসদ, কেউই আম-জনতাকে আজ-ও গুছিয়ে বলেননি। আমরা জানি, পশ্চিম বাংলার সরকারের নিজের হাতে বানানো আইন রয়েছে- কিন্তু অন্য সমস্ত আইনের মতো এখানেও মাওবাদী চক্রান্ত রুখতে সরকারের এত সময় চলে যায় যে সরকারের পক্ষে শ্রমিকদের মতো ফালতু নাগরিকদের নিয়ে মাথা ঘামানর মতো সময় কোথায়!

সরকার 'চক্রান্ত' সামলানো নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, আমরা বরং সেই অবসরে কারখানার জমিতে কারখানার কাহিনী জানার চেষ্টা করি। বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাহিনী দিয়ে এবারের গল্পের শুরু। ৬০-এর দশক, 'বাংলার রূপকার', এবং বামফ্রন্টের বর্তমান চেয়ারম্যান, শ্রী বিমান বসুর মতে 'দক্ষ প্রশাসক', প্রয়াত ডঃ বিধান রায়ের যুগ ; এই বাংলা তখন শিল্পের জন্য ভারতখ্যাত! ১৯৬০ সালে সমরেশ বসু বর্ণিত সেই বিটি রোডের ধারে, কামারহাটি অঞ্চলে বেণী লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় - পরবর্তীকালে তার নাম বদল হয়ে হয় বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং। এই বাংলার কারিগরী ট্রাডিসন বজায় রেখে এখানে একে একে তৈরি হতে থাকে অতি উৎকৃষ্ট মানের যন্ত্র, সঙ্গে ভালো জাতের যন্ত্রাংশ-ও। এখানের উৎপাদিত যন্ত্রাংশ এত-ই ভালোজাতের ছিলো যে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক-ও কালক্রমে বেণী থেকেই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অনেক কিছুই বেণী থেকে বানিয়ে নিয়ে যেত। পরে এদের দেখাদেখি কলকাতার ট্রাম সংস্থা, এমন কি ভারতীয় রেল-ও বেণীর থেকে জটিল এবং উচ্চমানের যন্ত্র কিনতে শুরু করে। পুরো কংগ্রেসী জমানা, দেশের অনুশাসনপর্ব অতিবাহিত হয়ে গেলে, জরুরী অবস্থার শেষে শান্তি এই বাংলায় কল্যাণরূপে বিরাজমানা হলে, সংগ্রামের হাতিয়ার বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হলে বেণী সংস্থা

প্রথমবারের জন্য বন্ধ হয়ে যায় - ১৯৭৯ এর জুলাই মাসে (কার চক্রান্তে তা বিমান বাবু এখন-ও বলেননি)। ইতিমধ্যে সংগ্রামের হাতিয়ার চোখের মণিতে পরিণত হয়েছে - দ্বিতীয় বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'অর্থনৈতিক কারণ'-বশত বেণী সেই ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত মাঝেমাঝেই বন্ধ হতে থাকে। এই সময়টা এই বাংলার পক্ষে খুব-ই টালমাটাল সময় - এই সময় আমরা জানতে পারছি যে কেন্দ্র-বিরোধী রাজনীতি আপাতত অচল, কেন্দ্র-বিরোধী জেহাদ থামিয়ে আপাতত কেন্দ্রের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জনগণকে অবিরত রিলিফ বিতরণ করতে হবে। ১৯৮৩-র জুন মাসে বেণী খুলল শেষ বারের মতো, তবে সেই সময়ে কর্মরত ১১০০ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৪৭০ জনকে নিয়ে।

এর ফাঁকে আজকের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সেই সময়ের বিদেশমন্ত্রী প্রণববাবু বিদেশভ্রমণের মাঝে টুক করে গ্যাট চুক্তিতে দস্তখত সেরে ফেলেছেন! এদেশের উদ্যোগপতিবৃন্দ তাঁদের বিদেশী ভাই-বেরাদারদের কাছ থেকে কারখানা বন্ধ করে কি করে আরও বেশি লাভ করা যায় তা শিখে ফেলেছেন। সারা ভারত সহ এই বাংলাতেও শুরু হয়েছে কারখানা রুগ্ন করার খেলা। একবার কারখানাকে রুগ্ন করতে পারলে অনেক অর্থনৈতিক ছাড় মিলবে সরকারের কাছ থেকে, ব্যাঙ্ক-এর সুদ গোনা থেকে রেহাই মিলবে, আর কে না জানে ব্যবসার মূল কথাই হলো মজুরী মেরে দিতে পারলে তবে অনেক মুনাফা হয়। ভারত সরকার এমন এক ছকে সক্রিয় মদতদাতা হিসেবে এগিয়ে আসে। তারা একটি সংস্থা তৈরি করে এবং তার নাম দেয় বিআইএফআর - বোর্ড অফ ইনডাস্ট্রিয়াল এ্যান্ড ফিনানসিয়াল রিকন্সস্ট্রাকসন। কাগজে-কলমে এদের কাজ ছিল বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা পুনরুজ্জীবন করা - কিন্ত বিআইএফআর তার জীবদ্দশাতে ক্রমাগত শুধু কারখানা গুটিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করে গেছে। বেণী সংস্থাটির সম্পদের তুলনায় বাজারে ঋণ বেড়ে যাওয়ায় সংস্থাটিকে বিআইএফারের কাছে পাঠানো হয় এবং বেণী কারখানাকে রুগ্ন বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৮-এ বেণী কারখানাটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

নিয়মমতে বিআইএফআর 'পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা' আহ্বান করে, কিন্তু বেণী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এবিষয়ে কোনো পরিকল্পনা জমা না পড়ায় কারখানাটি গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইংরাজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য যেমন ফাঁসুড়ে মজুত, তেমনি আইনি কায়দায় কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকা বন্দোবস্ত রয়েছে। এই পদ্ধতির নাম বিলুপ্তিকরণ - সাহেবি ভাষায় লিকুইডেসন। এই কাজটি নিশ্চিন্তে সম্পন্ন করবার জন্য রয়েছে ওফিসিয়াল লিকুইডেটর। কারখানা তুলে দেওয়ার এই পুরো বিষয়টিকে আইনি ছাপ দেওয়ার জন্য কলকাতা উচ্চ আদালতের ন্যায়াধীশ মাননীয় শ্রী বাবুলাল জৈন মহাশয় বেণী কারখানা লিকুইডেসনের আদেশ দেন ১৯৯৪ সালের ২২ শে জুলাই। পরের বছর, ১৯৯৫ সালের অক্টোবর ১৬ সরকারি লিকুইডেটর, শ্রী উজ্জ্বল রায় মহাশয় বেণী নিলামের শর্ত ঘোষণা করে বললেন: ' এই কারখানাকে একটি চালু কারখানা হিসেবে কিনতে হবে এবং সমস্ত পুরোনো শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করতে হবে। বিক্রির নির্ধারিত মূল্য ৯০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং পুরো টাকা দেওয়ার পর-ই মাত্র [মালিক] কারখানাসহ ৪০ বিঘা জমির দখল নেওয়া যাবে।' এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে বেণীর সমস্ত সম্পত্তির যে তালিকা সরকারি ভ্যালুয়ার তৈরি করেছেন, ক্রেতা সংস্থাকে তা মেনে নিয়েই সংস্থাটি কিনতে হবে।

এই পর্যন্ত যা বলা হলো তা গড়পড়তা অন্যান্য বন্ধ কারখানার কাহিনীর মতোই; কিন্তু বেণীর গল্পটা একটু আলাদা রাস্তা নিয়েছে। বেণীর নিলামের সময় যদিও বলা হয়েছিলো যে বেণীর কারখানার জমির পরিমাণ হলো ৪০ বিঘে, কিন্তু আদতে বেণীর জমির পরিমাণ ছিলো ৬৬ বিঘার আশেপাশে। যে সময়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে, তখনই বেণীর জমির বাজার দর হওয়ার কথা ছিলো ১৫ কোটির কাছাকাছি - কিন্তু সিংহানিয়া বাবু সরকারি দামে মাত্র ১.৫৭ কোটি টাকায় জমিটি বাগিয়ে নেনা মহামান্য আদালত কিন্তু পই পই করে ক্রেতা সংস্থা, অর্থাৎ

রত্নগিরি সংস্থাকে বলে যে সংস্থাটি কিনে চালু না করলে সরকার লাইনে দ্বিতীয় সংস্থা, প্রাচীকে মালিকানা হস্তান্তর করে দেবে। খুব ঘটা করে সিংঘানিয়া বেণীর দখল নেন জুলাই ৭, ১৯৯৬ এ। কারখানা বন্ধের পর আটটি বছর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত - একে তো দফায় দফায় কারখানা খোলা-বন্ধ হওয়ার সময় থেকে কখনওই সব শ্রমিক আর কাজ ফিরে পাননি, তার উপর কারখানা ৮ বছর বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের দুর্দশার অবধি ছিলোনা। অন্যান্য সমস্ত বন্ধ-রুগ্ন কারকানার মতো বেণীতেও মৃত্যু এবং আত্মহত্যার মিছিল সুরু হয়। মৃত্যুর মিছিলে সামিল হন ৪০০ জন শ্রমিক - কারখানার শুরুতে বেণীতে যত জন নিয়মিত কাজ করতেন, এই সংখ্যাটা তিনভাগের এক ভাগের চেয়েও বেশি!

১৯৯৬ এর অগষ্ট ১১ গণেশ সিংহানিয়ার সঙ্গে চার চারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন-এর নেতৃবৃন্দ এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই করে। এই চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে বলে নেওয়া জরুরি। ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ মেনে নিয়েছিলেন যে

১। কম্পানি কাগজপত্র দেখে ঠিক করবে কারা কারা এখনও কাজ করতে পারবে। এই বিষয়টি নির্ধারিত হবে শারীরিক সক্ষমতার ভিত্তিতে। নির্বাচিত শ্রমিকদের নামের তালিকা ইউনিয়নের কাছেও থাকবে।

২। কম্পানি শিল্প-উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করবে। এই সংযোগ এসে গেলে এক বছরের মধ্যেই সমস্ত শ্রমিকে নিযোগ করা হবে। কোনো করণে যদি এই সমসসীমা বাড়াতে হয় তো চবে মালিক আবার ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তা স্থির করবে।

৩। শ্রমিকরা কত মাইনে পাবেন তা ঠিক হবে শিল্প চালু হলে।

৪। এই সমস্ত সমঝোতাসূত্র আলোচনার ১৫ দিনের মধ্যে এই কম্পানির সমস্ত সক্ষম শ্রমিকবৃন্দ কম্পনির কেছে আবার কাজ চেয়ে আবেদন জানাবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে তাঁদের প্রমাণপত্র দিতে হবে যে কারখানাটি বন্ধ হওয়ার আগে তাঁরা এই কাখানার নিয়মিত শ্রমিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের বলেও দিতে হবে তাঁরা কোন ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন! কম্পানি তাদের নিজস্ব কায়দায় এই সব তথ্যের সত্যতা যাচাই করে শ্রমিকদের নতুন করে নিয়োগপত্র দেবে।

৫। কম্পানি এখানে নতুন প্রকল্প হিসেবে পাখা উৎপাদন ও আয়রন ফাউনড্রি গড়ে তুলবে। বন্ধ হওয়ার সময়ে শ্রমিকদের বকেয়া বেতনের কথা মনে রেখে চারা শ্রমিক পিছু ১৮০০ টাকা দেবে।

এই সব কথা খুবই মিষ্টি আর বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভালো লাগারই কথা। তবে শ্রমিকরা তো 'ঘর পোড়া গরু', তাই তাঁরা 'সিঁদুরে মেঘের' ইঙ্গিত বোধকরি আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য যে চুক্তিতে সই দিয়েছিলো, তাতে শ্রমিকদের পক্ষে বেশ কিছু বিপজ্জনক বিষয় ছিলো। যেমন, যতদিন না শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ মিলবে ততদিন কারখানার ভেতর পরিস্কার করা সহ অন্যান্য কাজ করানর জন্য কম্পানি বাইরের ঠিকাদারের মাধ্যমে মজদুর নিয়োগ করতে পারবে, শ্রমিকরা বা শ্রমিক ইউনিয়ন, কেউই এই নিয়ে আপত্তি তুলতে পারবেনা!

মালিকের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জাগে যখন আমরা এই চুক্তির ১৬ তম ধারাগুলোকে একটু বিশদে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। কয়েকটা বিষয় হলোঃ

(ক) কমপানি বলছে যে তারা এই কারখানায় নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করবে। এই উদ্দেশ্য তারা নতুন পণ্য উৎপাদনের কথা মাথায়

রেখেই তাদের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। এই নতুন উৎপাদন ব্যাবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদ কম্পানি তার কারখানা থেকে সরিয়ে ফেলে সেগুলো তারা বাজারে বিক্রি করে নতুন সমস্ত যন্ত্রর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবে। অবশ্য কম্পানি এই সব কাজ করবে চুক্তিমতে শ্রমিকদের যে যে আর্থিক প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলো সেগুলো পুরো মিটিয়ে দেওয়ার পর।

(খ) কম্পানি স্রেফ কাগজে-কলমে যে নতুন প্রকল্পের কথা বলেছিলো, সেই কাল্পনিক প্রকল্পর জন্য দরকার হলে বেণীর বর্তমান মালিক, শ্রী সিংহানিয়া, বেণীর মধ্যে যে সব গোডাউন বা শেড রয়েছে, সেগুলোকে প্রয়োজন হলে ভাঙতে পারবে অথবা কম্পানি মনে করলে সেই সব শেড বা গোডাউন তৃতীয় কোনো সংস্থাকে বিক্রি বা লীজ দিতেও পারবে। এমনটা ঘটলে শ্রমিক বা অন্যান্য কর্মচারিরা এতে কোনো বাধা দিতেও পারবে না।

(গ) কারখানা চালু হলে মালিক মনে করলে সময় সময় ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে; এই নিয়ে ইউনিয়ন কিছু বলতে পারবে না।

(ঘ) চুক্তির এই সব শর্ত শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষ ১৯৯৯ এর জুলাই, ৩১ পর্যন্ত (তিন বছর পর্যন্ত) মানতে বাধ্য থাকবে।

এখানে বলে রাখি যে এই চুক্তিতে যে যে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন সই দিয়েছিলো তারা হলো সিআইটিইউ, আইএনসিইউসি, এইচএমএস এবং বিএমএস-র নেতৃবৃন্দ। এত কিছু বলার পরও যখন এক বছরেও কিছুই হলোনা, তখন আবার একটি দ্বিপাক্ষিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে। মালিক শ্রী সিংহানিয়া নিজে সেই মিটিং-এ

উপস্থিত থাকেন, উপস্থিত থাকেন বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দ,; এমনকি এই ইউনিয়নের সঙ্গে, এই কারখানার সঙ্গে যাঁক কোনো যোগাযোগই নেই, সেই শ্রী অমিতাভ নন্দী মশাইও (যিনি এখন স্থানীয় সাংসদ, কিন্তু তখন তিনি তা ছিলেননা) উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৯৭ চারজন শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে শ্রী সিংহানিয়ার উকিলবাবু সরকারি লিকুইডেটরের কাছে গিয়ে তাঁর কাছে শ্রমিকদের পাওনা বাবদে যে টাকা গচ্ছিত রয়েছে তা পাওয়ার জন্য আবেদন করবেন। বেণী কারখানা বন্ধ হওয়ার শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা মালিক জমা দেয়নি। এই মিটিং-এ আরো ঠিক হয় যে মার্চ ১৯৯৭-এর মধ্যে সেই বকেয়া টাকা পিএফ কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে যেসব জটিলতা রয়েছে, সেগুলোর সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য কম্পানি হাইকোর্ট-এ আবেদন করবে। যে নতুন প্রকল্পর এত গল্প কম্পানি এতদিন শুনিয়ে এসেছিলো, সেই সংক্রান্ত একটি স্কীম কম্পানি ১৯৯৭ মার্চ-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে। যথারীতি কোনো কিছুই না হওয়ায় শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন এবং আবার ইউনিয়ন নেতাদের টনক নড়ে। এইবার এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে - বলা হলো যে মালিকের সঙ্গে মৌ সই হলো, কিন্তু তাতে সই তিন ইউনিয়ন নেতার, শ্রী সিংহানিয়া বা তাঁর কোনো প্রতিনিধি সেই মৌ-তে সই দিলেননা। এই মৌ-তে আবার পিএফ জমা দেওয়া, শ্রমিকদের পাওনা মেটানো এবং স্কীম জমা দেওয়া, সব শেষে কারখানা খোলার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

কিন্তু কারখানা খোলা তো দূরঅস্ত, অবস্থা হয়ে রইলো যে কে সেই। এরপর শ্রমিকরা এই চুক্তির শ্রমিক-বিরোধী ধারাগুলো নিয়েও সরব হতে শুরু করে। সবশেষে ১৯৯৭ সালের নভেম্বর ১১, শ্রমিকরা শেষমেশ প্রতিষ্ঠিত ট্রেডিউনিয়নগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, গড়ে তোলেন তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগের সংগঠন - বেণী বাঁচাও কমিটি; এই কমিটিতে

এসে যোগ দেন দলমত নির্বিশেষে বেণীর শ্রমিকদের একটা বড় অংশ। এর পরের কাহিনী হলো এই কমিটির নেতৃত্বে বেণী বাঁচানর সংগ্রাম।